ছেঁড়া সড়কের আলো

চিত্ররথ দত্ত

বর্ষা-ধোয়া ঝকঝকে আউশের ক্ষেত চিরে টানটান রাস্তা। প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা বেশি ভদ্রস্থ, তাই বহুদূর চলে যাওয়া এক কালোর পোচ মনে হচ্ছে। রজতের অ্যাম্বাসাডর গাড়িটার ভেতরের স্বাস্থ্য ও বাইরের বাঁধুনি দুটোই রীতিমতো ভালো। তবুও চা-টা যথেষ্ট সাবধানে না খেলে চলকে পড়বেই। তীব্র হাওয়া ও গতির একটা ঝামেলা আছে না।

সকাল সাতটায় ই.এম.বাইপাস গড়িয়াহাট সংযোগ থেকে রওনা দিয়েছি। এখন সাড়ে নটা। ডায়মন্ড হারবার রোডের এক অচেনা দূরে। আর কিছুক্ষণ গেলেই নামখানায় পড়ব। এভাবে চললে এগারোটা নাগাদ ফ্রেজারগঞ্জ সরকারী-মাছ-পান্থনিবাস। গোঁজামিলে ভরা হলেও হাতমুখ ধুয়ে ঠান্ডা লিমকা আর ভদ্‌কা নিয়ে লম্বা বসা তো যাবে। অদুরে ছেদহীন উদ্দাম স্ফটিক হাওয়ার সমুদ্র-একেবারে অন্য রকম হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়া পাখার মতো চাকার গতি ঝপ করে কমে গেল। তারপর দুর্বল হতে হতে পুরোপুরি থেমেও গেল। প্রথমে পেছনের আসন থেকে উঁচু হয়ে তারপর জানলা দিয়ে মুখ বের করে দেখলাম। টাটা-সুমো, মাতি-অমনি, ম্যাটাডর ভ্যান, অ্যাম্বাসডর ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পরিবহনের রঙ-চটা লাল-সবুজ বাসও পর পর নিথর হয়ে আছে। নেমে পড়া কিছু মানুষ রাস্তায় অলস ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে সামনে

হতাশ বিরক্তির জবাব এল, কী জানি, শুনছি তো অ্যাকসিডেন্ট।

ঘড়িতে সাড়ে ন'টা। এখন পর্যন্ত ভালোই আসা গেছে, দশ-পনেরো মিনিটে তেমন ক্ষতি নেই। পরে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। বাইরে নীল আকাশের ঠা-ঠা রোদ, তবু ভাদ্রমাসে অচল গাড়ির ভ্যাপসা ছায়ায় বসে থাকা যায় না। কাছাকাছি বড় গাছ নেই বলে রাস্তার ধারের ছড়ানো ছায়াগুলো উধাও। যা আছে সবই দু-এক মানুষ সমান ছোট ছোট। বড়গুলো গেল কোথায়, কেটে নিয়ে গেছে। এ রাজ্যে সবই তো বারোয়ারী, লুটের মাল। এই প্রথম রাস্তাটাকে আর ততো ভালো মনে হলো না। অদূরে লম্বা-দূরের যাত্রীরা রঙচটা তোবড়ানো সেই সরকারী বাসের বিশাল শরীরের ছায়ায় অগত্যা সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। শুধু দু-পাশ থেকে অবাধে যাতায়াত করছে সাইকেল রিক্সা ভ্যান। স্কুলের ছোট-বড় ছাত্র-ছাত্রী, শিশু কোলে ঘনিষ্ঠ দম্পতি, মালপত্র আগলে বসা ব্যাপারী। মাইকে বিজ্ঞাপন বাজিয়ে যাত্রার লোক, মরা গু, - চলমান অবাধ জীবন। এমন কি, কোনো দেশোদ্ধারী নেতার সভায় আওয়াজ তোলার জন্য ছোট ছোট দলের ঝান্ডা ধরা রাজনৈতিক প্রজাতিও বাদ নেই। মানতেই হয় এই সর্বহারার রাজ্যে সাইকেল-রিক্সা ভ্যানই এখন আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়া সবচেয়ে গতিশীল পরিবহন ব্যবস্থা। কেউই এদের গতিরোধ করতে পারে না। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী কোনো এক এঁদোপোড়া গ্রামে এই যানে চড়ে ডাকাত সায়েস্তা করতে যাবার পর থেকে এর মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা কোথায় পৌঁছেছে এখনো সঠিক হিসেব করা যায় নি। রজত আর সমরও গাড়ি থেকে নেমে এল। পরিস্থিতি বুঝতে তিনজনে এগোতে লাগলাম। খান কুড়ি বাইশ গাড়ি পেরিয়ে এসে দেখলাম একটা ছেঁড়া গ্রাম, ভিড়। মহিলা ও নানা মাপের বাচচাই সংখ্যায় বেশি উঁকি ঝুঁকি দরকার হলো না, পাতলা ভিড়ের মধ্যে চিৎ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে রয়েছে একটি শিশু। অপুষ্টির শিশুর বয়স মালুম হয় না, পাঁচ থেকে দশ যে-কোনো একটা হতে পারে। ঘাড় ভাঙার মতো মাথাটা বিশ্রী কাত। ধুলো কাদায় নোংরা হাফ প্যান্ট আর রঙ ওঠা

হালকা গোলাপ শার্ট। বুকের কাছে একটিই মাত্র বোতাম এখনো কী কায়দায় আটকে আছে। বাঁ পায়ের, ধুলোময় নরম কচি পাতাটা সম্পূর্ণ অক্ষত রেখে হাঁটু থেকে চামড়াটা কলার পু খোসার মতো ছাড়িয়ে নিয়ে যেন পাশেই সাজিয়ে রেখেছে কেউ। ছাল ছাড়ানো পাঁঠার পায়ের মতো, এবার ঝুলিয়ে দিলেই হয়। মাথাটার হেলানো দিকের চোখটা খা নিকটা ঘিলু শুদ্ধ উপড়ে কানের পাশে ঝুলে আছে। কচি-কাঁচা সন্তানদের নিয়ে মায়েরা পরম আলস্যে এই বিরল দৃশ্য দীর্ঘ সময় দেখছে। বৈচিত্র্যহীন, আরামহীন, চাহিদাহীন, বোধহীন জীবনে এগুলোই বিনোদন। এক পাশে দাঁড়ানো সাতে-পাঁ াচে নেই ভঙ্গির একটি তণকে জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেটির কেউ নেই।

চোখের ইশারায় ধানক্ষেত পার একদিকে দেখিয়ে বলল, আনতে গেছে।

গাড়িতে ব্যাগে নতুন রোল ভর্তি দুটো ক্যামেরা। ঠিকই করে বেরিয়ে ছিলাম মূলত সমুদ্রেরই দীর্ঘ একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ধরব। আর কোনো চমক ধরানো দৃশ্য বা ঘটনা যদি চলতি পথে এসে যায়। এই অপরিচ্ছন্ন জীর্ণ মানুষগুলোর অলস উদ্দেশ্যহীন প্রবহমান জীবনের মর্মান্তিক অসহায়তা ক্যামেরার বিষয় বটে। পুরো একটা রোল এখানেই শেষ করে দেওয়া যায়। এমনকি শিশুটির জীবন্ত মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর ছবিটাকে ভয় পাইয়ে দেবার মতো মস্ত বড় কোনো পোস্টারের বিষয় কার যায়। কিন্তু তবুও না। অনেক তুলেও তো জীবনের কত ছবিই তোলা হয়নি। অনেক প্রিয় ছবিও তো মনের মধ্যে অক্ষত ধরে রাখতে পারিনি।

শুনতে পেলাম একটা আর্তনাদের কান্না দূরের মাঠ পেরিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ধানক্ষেতের আল ধরে প্রবল ঝড়ে উত্তাল ক্ষীণ ডালপালার মতো আছাড় খেতে খেতে এক কঙ্কালসার মা সহমরণে যাবার জন্যে আসছে। কী কাণ্যময়, যন্ত্রণ াময় এক ক্যামেরার বিষয়। ফিরিয়ে আনার জন্য সন্তান অবধি আর পৌঁছতে পারল না। রাস্তার ঢালের শেষে নালার মতো জলকাদায় উপুড় হয়ে পড়ল। নির্জীব চিৎকার কান্নায় যে কথাগুলো ব লতে লাগল তা অতলান্ত গভীর, দুর্বোধ্য। এমন তো হতে পারে কথাগুলো শিশুটির কানে পৌঁছচ্ছে। এমন এক উপায়ে যা আমরা এখনো জানিনা। এই ছিন্নভিন্ন মা-টিকে নিয়ে কার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। মানুষের মৃত্যুর মতো স্পষ্ট ছবিই মানুষ সবচেয়ে ঝাপসা দেখে।

শিশুটি রাস্তার খানিকটা ধারেই পড়ে আছে। সেই হিসেবে আমাদের গতিপথ প্রায় পুরোটাই খোলা। তবুও দু-দিকে যতদূর চোখ যায় নিথর গাড়ির সার। শনি-রবি ছুটিতে ফ্রেজারগঞ্জ-বকখালি যাবার হরেক শহুরে পরিচ্ছন্ন গাড়ি ছাড় াও, বিবর্ণ-মলিন বাস, মাছ ও সবজি ব্যবসায়ী বোঝাই ম্যাটাডর টেম্পো কম নয়। একজন খোঁজ নিয়ে জানাল প্রায় ম াইল খানেক দাঁড়িয়ে আছে।

আস্তে করে একটা পুলিশের জীপ এসে দাঁড়াল। আমাদের রওনা ছাড়াও একটি শিশুর মর্মান্তিক মৃত শরীর এতক্ষণ অবহেলায় রাস্তায়পড়ে থাকা অসভ্যতার এক বিভৎস নিদর্শন। বুকে নামের ফলক একটি সুদর্শন তণ অফিসার নামল । সঙ্গে দুটি মাত্র বন্দুক-সেপাই, পঞ্চাশোর্দ্ধ, ক্ষীণকায়, নির্জীব। শরীরের উদাসীন ভাষা নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল তার া। সম্ভবত এসব পথের রাজনৈতিক অঙ্কটা তাদের খুবই জানা। ততক্ষণে চার-পাঁচ জন মাতববরের একটা জরী কমিটি গড়া হয়ে গেছে। এক পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি চলা শুর পুলিশি প্রস্তাব করাকরি নাকচ হয়ে গেল। পুলিশকে আপাতত একজন আলোকচিত্রীর ব্যবস্থা করতে হবে যে দেহটির সঠিক অবস্থানের কতগুলো প্রয়োজনীয় ছবি তুলবে। তারপর অ ানতে হবে স্ট্রেচার, অন্য কোনো ভাবে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

ঘড়ির উদ্দেশ্যহীন কাঁটা এগারোটা বাজতে দশে পৌঁছে গেছে। তণ অফিসারটিকে অসহায় রেখে বন্দুকধারী দুজন আলো াকচিত্রী ও স্ট্রেচার আনার নামে হাঁপ ছেড়ে নিজেদের গাড়িতে উঠে বসল। দেখলাম এতক্ষণ গুচ্ছ গুচ্ছ জমাট হয়ে থাকা ভাদ্রের শাদা-কালো মেঘ ফ্যাকাশে হয়ে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে বৃষ্টি নামাবে বলে। রজতকে বললাম তোমার দামি ফ্ল

াস্কেচা নিশ্চয়ই এখনো গরম আছে?

চায়ের আশায় আবার গাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র অবাধ সুবিধাপ্রাপ্ত ট্রান্সপোর্ট, স াইকেল ভ্যান পরম আত্মবিশ্বাসে অনবরত যাতায়াত করছে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। পথের গুদায়িত্বে থাকা কর্মীরা, কোথা থেকে কিছু থান ইঁট নিয়ে এসে রাস্তার এপার-ওপার ফাঁক ফাঁক পেতে দিয়ে সুখী শরীর বাঁচাতে সরে গেল এদিক-ওদিক। এই ইঁটের সারি সীতার জন্যে লক্ষ্মণের কাটা গন্ডির চেয়ে অনেক বেশি নিষিদ্ধ। এই কঠিনতম সাবধানী বেড়া পার হয়ে অ াদৌ আজ ফ্রেজারগঞ্জ পৌঁছতে পারব কিনা ভাবছিলাম।

আমাদের পাশাপাশি হাঁটতে থাকা কোনো গাড়ির এক অভিজ্ঞ চালক স্বগতোক্তির মতো বলল, এই অঞ্চলের পার্টির দাদ ারা খুবই ভদ্রসভ্য।

রীতিমতো কৌতূহলে আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম কেন!

চালক বলল এখনো গাড়িগুলোতে আগুন লাগানো হয়নি, এমন কি আমার আপনার গাড়ির কাচও ভাঙেনি।

মনে মনে ভাবলাম সত্যি তো! অবস্থায় না পড়লে কত মানুষের কত গুণ অজানাই থেকে যায়।

ভিজতে ভিজতে হাঁটা খারাপ লাগছিল না। দাঁড়াই বা কোথায়? শিশুটির শরীর নরম স্নালে এক দফা ধুয়ে উঠল এতক্ষণে। মা কি কোনো ভাবে সন্তানের কাছে পৌঁছতে পেরেছে?

ধরা বৃষ্টি পুরোপুরি থেমে ঝকঝকে নীলের বিস্তৃতি থেকে ঠা-ঠা রোদ জ্যা-যুক্ত তীরের মতো সমস্ত পথ-প্রান্তর আবার বিদ্ধ করল। কোথাও হাওয়া নেই। অসংখ্য গাড়ির প্রায় শব্দহীন অজস্র মানুষ যেন শেষ যাত্রার জন্যে একটা স্ট্রেচারের অপেক্ষা করছে।

রাস্তা শুকিয়ে উঠল। পুলিশের জীপ ফিরেছে। ছবি তোলা শু। চায়ের কাপ হাতেই আবার একটু এগিয়ে গেলাম। এরকম ফরমাশ ছবি তোলার জন্যেও কত মানুষ প্রস্তুত হয়ে থাকে। নিশ্চয় কোনো অপ্রচলিত আলোকচিত্রী আরো অপ্রচলিত হয়ে যাওয়া ক্যামেরায় অবহেলা-মলিন মৃত শিশুর ছবি তুলে বেড়ায়। স্ট্রেচার আসেনি কারণ কাছে দূরে কোনো গ্রামস্থ চিকিৎসা কেন্দ্রে হয়তো সেটাও নেই। ভিড়টা বাড়ছেও না কমছেও না। বাসের চাকায় থ্যাঁতলানো শিশুর মৃতদেহ দেখার মজাও ফিকে হ'য়ে এসেছে এতক্ষণে। শিশুটির মা-বাবা বা তেমন সম্পর্কের কেউ এখানে নেই বোঝাই যাচ্ছে। বিশৃঙ্খলা তৈরি করার মতো কাউকে যে দায়িত্বশীল কর্মীরা এখানে বেশি ঘেঁষতে দেবেনা তা বলাই বাহুল্য। শেষ পর্যন্ত পুলিশ অফিসারটির সঙ্গে স্ট্রেচার-হীন সাইকেল-ভ্যানের খোলা তত্তাই রফা হোল। এখানে বেশ কয়েকটা গ্রাম্য দোকান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেরকম একটা মাচায় বসানো ভাঙাচোরা টিনের পান সিগারেটের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছে বন্দুকধারী দুজন। অফিসারটির মোটা খাকি পোষাক ঘামে জবজব। এক ধরণের ঘাম-ঝড়ানো চাকরিই বটে। শিশু-দেহর পাশে সাইকেল-ভ্যানটি দাঁড় করিয়ে কীভাবে ওটা তোলা যায় অফিসারটি কর্মীদের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করছে। দ্রুত ফিরে এসে গাড়িতে উঠে বসলাম।

প্রতিটি গাড়িই বোধহয় যাত্রা শুর সঙ্কেত পাবার উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে। দশ মিনিট পেরিয়ে গেল কোথাও কোনো গ াড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ, নড়াচড়া নেই। চলতি পথে একজন জানিয়ে গেল এস-ডি-ও এসে দাবিদাওয়া আলোচনায় না বসা অবধি রাস্তা খুলবে না। মনে হলো কেন যে মহান নেতাদের মতো দাড়ি রেখে দার্শনিক হলাম না? - কেন যে ব্যাগ

ভর্তি করে দুটো ক্যামেরা এনেছিলাম। নিজের বোঝাই আর যেন বইতে পারছি না, - একাধিক রঙিন ও শাদা-কালো ফিল্ম রোল। তাতেও শানায়নি, প্যাড, কলম যদি কিছু লেখার থাকে। কয়েকটা প্রলুব্ধময় দামি বিদেশী পত্রিকা। স্নায়ুতন্ত্রের যা অবস্থা হচ্ছে এসবের বদলে আরো দুটো বোতল বেশি আনা দরকার ছিল। এখনো বহু পথ বাকি।

আবার বৃষ্টি। ছাতাহীন বাইরেটাই শ্রেয়। একটু ভেজার সঙ্গে ধানক্ষেত থেকে মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝলক তবু আরাম দেয়। গাড়িতে হেলান দিয়ে দূরে অবসন্ন তাকিয়ে ছিলাম। আকাশ-পাতাল ভাবনা কি কোনো ভাবনা না আসার মতো অসহায়তার মধ্যে ডুবে যাওয়াই বলে? রজত আর সমর বলল, চলুন তো দত্তদা ব্যাপারটা কী খোঁজ নিয়ে আসি।

সিগারেটের আকর্ষণ অনেক দিন ঝাপসা হয়ে গেছে। গাড়ির মধ্যে আধোঘুমের অনুতোষকে নাড়িয়ে দিয়ে একটা সিগারেট চাইলাম। একমাত্র অনুতোষই এখনো পকেটে নিয়মিত প্যাকেট রেখে ধোঁয়া ওড়ায়।

শিশুটি এতক্ষণে চালান হয়ে গেছে। এখন এখানে চলছে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন। রক্তের দাগ বিশেষ নেই শরীরে কতটুকুই বা ছিল। তা-ও দফায় দফায় বৃষ্টিতে ধোয়া হয়ে গেছে। আরো খানিকটা এগোতে হলো। এখানে বড় গাছের ছায়া। বিক্ষিপ্ত হতশ্রী চালাঘরের জীর্ণ পাড়া। তারমধ্যে রাস্তার ধারে স্বমহিমায় একটা টালি ছাওয়া পরিচ্ছন্ন বিস্তৃত ক্লাব-ঘর। ইংরেজদের নিয়ে আসা আশ্চর্য-সুন্দর ক্লাবঘরের ভাবনা গত পঞ্চাশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে মাতববর-ঘরে পরিবর্তিত হয়ে রোগজীবাণুর মতো বাঙালীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। - সেই একই বিনোদন-সন্ধানী বাচচা, মহিলা, বুড়ো-বুড়ির জীর্ণ জটলা। ঘাম আর বৃষ্টি জবজবে তণ অফিসারটিকে এখন অনেকটা বয়স্ক লাগছে। উঁকি মেরে দেখলাম এখান থেকে ফোনে উঁচু মহলের নির্দেশ আনার চেষ্টা করছে। মাতববর-ঘরের জলুস রীতিমতো সম্ভ্রম জাগায়। প্রশস্ত ঘরে মূল্যবান টেবিল, চেয়ার, ফোন, টিভি, মহান নেতাদের বড় বড় ভালো বাঁধাই ছবি। এর বাইরে অঞ্চলের হতশ্রী মানুষদের ক্লিশিত গতিহীন চলমান জীবন। দেখলে বোঝা যায় এই সব সর্বহারাদের দেখভালের জন্যে এমন একটা মাতববর সমৃদ্ধ ঘর কতটা জরি ছিল।

কোনো অলৌকিক উপায়ে রফা হ'লো। ওপার থেকে ব্যস্ত কোনো নেতা এপারের সারাদিনের সক্রিয় বড়দাদাকে চাইলেন। একটা চাঞ্চল্য - ঢেউ উঠল। দুজন তৎপর কর্মী ছুটে, বেরিয়ে গেল দাদাকে খুঁজতে। খানিকটা শব্দহীন অধীর সময়। বড়দাদা ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকল। কয়েক মুহূর্ত জরি কথাবার্তা। তণ-অফিসারের টানটান খাকি শরীরে শিথিলতার ছায়া পড়ল। কয়েকজন কর্মী দ্রুত বাইরে এসে ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত তুলে গাড়ি চলাচলের আদেশ দিল। দায়িত্ব ও কাজের কুশলতা দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। - ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় বারোটা আটত্রিশ।

নামখানায় আতানিয়া-দুয়ানিয়া নদী ফেরিতে পার হওয়া। গঞ্জ বলা যায়। বড়সড় খালের মতো নদীর চেহারা। ইঞ্জিন-চলা বড় নৌকো আর বজরার ভিড়। ছোট আর মাঝারি দাঁড়- নৌকোও কম নয়। মজুরদের মাথায় অনবরত বরফের চাঁই ঢুকছে বজরার পেটে। একই সঙ্গে সেই পেট থেকেই নানা রঙের বড় বড় প্লাসটিক বাস্কেটে সার দিয়ে ইলিশ খালাস হচ্ছে, এসব মিটলে আবার মোহনায় যাত্রা অনিশ্চিত দিনের জন্যে।

ফেরিতে নগদ মূল্য প্রাইভেট গাড়ি তিনশ, ম্যাটাডর ভ্যান চারশ। বাধাহীন নগদহীন অন্য কোনো স্বাধীন পথ নেই। অনন্তকাল এটাই চলছে। ইঞ্জিন চালুর পর ওপারে পৌঁছে ফেরি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়তে সময় লাগে বেশি ধরেও দশ মিনিটে। একটা নাতিদীর্ঘ সেতু বানালেই অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়। কিন্তু বানায় কে? সারা বছরে যত মাছ ওঠে। তারচেয়ে অনেক বেশি তাজা টাকা ওঠে ওই আতানিয়া দুয়ানিয়ার জল থেকে। আমাদের সামনে মালভর্তি ট্রাক। পেছনে আর একটা না আসা পর্যন্ত অনিশ্চিত সময় গোনা। ঘড়ির কাঁটা দেড়টা ছাড়িয়েছে। ঘড়ির বাজাবাজিতে এখন যেন আর কিছুই আসে যায় না। আর কিছুক্ষণ এভাবে চললে নিজেদের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী ভাবতে অসুবিধে হবে না।

ছাড়া পেয়ে দু-চার মাইল পরে গাড়ি চলাই দুষ্কর হলো। কোনো কালে কি পিচ ঢেলে বাঁধানো হয়েছিল? প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়। মাঝে মাঝে আকণ্ঠ মাল আর মানুষ নিয়ে এখান দিয়েই ম্যাটাডর ভ্যান ও যাত্রী বাস অনিসিচত গন্তব্যে যাচ্ছে। অসুস্থ গর্ভবতী গাভির মতো তাদের পড় পড় চলন। পচা জল আর কাদার খোবলানো ঢেউ। তার মাঝে ছোটবড় ইঁটের ভয়ঙ্কর দাঁত বের করে থাকা। বহু যুগের পরিত্যক্ত পথও কি এমন হয়। এরই মানানসই দুপাশে ইতস্ততঃ জীর্ণ মলিন ছোটবড় কুঁড়ে। যেন এ সব কিছুই ভুলিয়ে দেবার জন্যে দু'পাশে নরম সবুজের বিস্তীর্ণ জলভরা ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে ঝাউ গাছের টুকরো টুকরো সার, আকাশের ঘন নীল আর গাঢ় শাদা-কালো মেঘের সমারোহে মাথা তুলে আছে। চালক ছেলেটির ধৈর্য ও সাবধানতার ভিতে ফাটল ধরছিল। গর্তময় ইটেল রাস্তায় এই যন্ত্রণার শেষ কোথায়। ভাবনায় আসছিল না, হঠাৎ গাড়ির পেটে আঘাতের বিশ্রী বড় শব্দে রজত আর্তনাদের মতো বলল, এই রে খেয়েছে, দ্যাখ দ্যাখ!

চালক ছেলেটি দ্রুত নেমে উবু বসে ঝুঁকে গাড়ির নিচে এক মুহূর্ত দেখল। তারপর পাথরের মতো মুখ করে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল।
সীমাহীন অধৈর্যে রজত বলল, কী হলো ?

ছেলেটি এক ধরণের উদাসীনতা নিয়ে বলল, মবিল চেম্বার ফেটে গেছে, সব মবিল পড়ে যাচ্ছে।

নামতে নামতে মনে হলো গাড়ি থেকে নামা নয় আরো অনেক গভীরে নামছি, রাস্তার মাঝখানে গাড়ি। পাশ দিয়ে আর কারো পথ নেই। সবাই মিলে ঠেলে একটা গাছের ছায়ায় অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত জায়গায় সরিয়ে নিলাম। দেখলাম ছেড়ে আসা রাস্তার ভিজে গর্ত মবিলেভরাট হয়ে উঠেছে। যে দুটি শীর্ণ মানুষ এইমাত্র গাড়ি দেখতে জুটেছিল মুহূর্তে কোন কুঁড়ে থেকে মলিন প্লাস্টিক পাত্র নিয়ে এসে তা কাঁচিয়ে তুলতে লাগল। আরো দু'চার জন কৌতূহলী জড় হচ্ছে। সারানোর একমাত্র ব্যবস্থা সেই নামখানা গঞ্জ। যেখানে ফেরি, সম্ভবত জাহান্নামে যাবার জন্যে গাড়িটা নদী পার করে দিয়েছিল। অন্তত ছসাত মাইল। ঘড়িতে সোয়া দুটো দুপুরের ধারালো রোদে ভিজে মাঠঘাট থেকে আবার সেই ভ্যাপসা গরম উঠছে। লজ্‌ঝড়ে সাইকেল-ভ্যান নিয়ে একটা ছোক্‌রা এসে দাঁড়াল।

এতক্ষণ গাড়ির আরামের পরেও ক্লান্তির সরীসৃপ যেন সহজ শিকার পেয়ে গিলে খাচ্ছে। ছোক্‌রাটিকে বলল, তুমি এখানে একটু থাকবে?
ছোকরাটি বলল কেন?
সমর বলল, চারিদিকে তো জলকাদা আর ভিজে ঘাস, তোমার এই গাড়িটায় একটু বসব। ছেলেটি হাসল, যতক্ষন আছি বসেন।

সমর, অনুতোষ আর অনীত তার ওপর পা ঝুলিয়ে উঠে বসল। রজত ভীত চোখে চালক ছেলেটির সঙ্গে উপায় খুঁজছে। মবিলহীন গাড়ির ছ-সাতমাইল চলা একমাত্র অলৌকিকেই সম্ভব। কোনো যাত্রীবাস বা মালের ভ্যান এলে গঞ্জে গিয়ে মিস্ত্রী খোঁজ করায় গতি ধরলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। মবিল চেম্বার সংস্কার হবে কী উপায়ে? ঢাল াই সরঞ্জাম কোথায়?

মলিন পাঞ্জাবি, অকালে বার্দ্ধক্য একজন মানুষ এসে দাঁড়ালেন। বিবর্ণতার মধ্যেও কোথায় একটা ভদ্রলোক ছাপ আছে। আশ্চর্য সুভাষী ও সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললেন, এই সামনেই হাঁটা পথে দুভাইয়ের দোকান আছে ওয়েলডিংয়ের কাজ করে। ওখানে দেখুন না হয়তো আপনাদের এটা করে দিতে পারে।

রজত বুদ্ধিমান, তাৎক্ষণিক বাকশৈলীতে যথাযথ পটু। প্যান্টটা ঝাড়তে ঝাড়তে ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গিয়ে হাসল অ

াপনি চেনেন? গাড়ির কাজ করে?

ভদ্রলোক বললেন, বাচচা ছেলে, চেহারায় চিনি পরিচয় নেই। ওয়েলডিংয়ের যা কাজ পায় তাই করে। এক আধটা চলতি গাড়িও অনেক সময় পেয়ে যায় কিছু কাজ করে দেওয়ার জন্যে। আপনাদের তো আর ইঞ্জিন সারাবার মিস্তিরির দরকার নেই। চলে যান না, কথা বলে দেখুন, দু'মিনিটের পথ।

এতখানি বিপর্যস্ত পথ পেরিয়ে আসার পর পোষাকি ধন্যবাদের বদলে প্রথম একজনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পেলাম আমরা।

রজত চালক ছেলেটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল। সব মবিল পড়ে গেছে?
ছেলেটি মাথা নাড়ল, দুলিটার মতো পড়েছে। এক সাইডে ফেটেছে বলে খানিকটা রয়ে গেছে।

রজত হতাশ হয়ে বলল, সে-ও তো আরেক ঝামেলা। মবিল শুদ্ধ ওয়েলডিং করতে গেলে যে কোনো সময় আগুন লাগতে পারে। চেম্বার খুলে তেল খালি করতে হবে তো। মিস্ত্রী লাগবে।

ছেলেটি বলল, না দাদা খোলাখুলিতে রিস্ক আছে। এত ঝাকানি আর বাড়ি খেয়ে কী অবস্থা হয়েছে কে জানে। চেম্বার খোলাখুলি করলে পরে নাট-বল্টু যদি আর ঠিক মতো না ধরে।

রজত বলল, ওভাবে ওয়েলডিংয়েরও খুব রিস্ক আছে। যাক গে, তুই আগে ছেলেদুটোকে ধরে আন। এই ভ্যানটায় করে চলে যা তাড়াতাড়ি হবে।

রজত আমার দিকে অসহায় হাসল। কিছু না বলে চুপ করে থেকে ভাবলাম মানুষের জীবনে সব সময়হ একমাত্র অনিশ্চয়ের সময় ছাড়া। তার দৈর্ঘ্য যত সহজে বাড়ে মানুষের ভাবনা ততই সীমাবদ্ধ হতে থাকে।
আমাদের আশর্চ্য করে সামান্য পরেই দুই ভাই নিয়ে সাইকেল-ভ্যান ফিরল। গ্রাম্য অপরিচ্ছন্ন, এখনো কৈশোর পেরিয়েছে কিনা ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু বয়সের চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী। গাড়ির নিচে খানিকটা চোখ রেখে বলল, যেমনটি আছে তেমনটি ওয়েলডিং করতে হবে।

রজত সাবধানী গলায় বলল, বিপদ হবে না? ছেলেদুটি চোখের কোনায় হাসল, হবে না তো মনে করি। এমনটা আমরা আগেও করেছি। এখানে মুবিলের বাক্সই আগে ফাটে। খুলতে গেলে ঝামেলা অনেক, এখানে কোথাও পার্টস পাওয়া যায় না, তাছাড়া আপনাদের কি অত সময় আছে?

মুগ্ধ হওয়ার মতোই একটা শব্দ তরঙ্গ। ঐ ভ্যানেই ওয়েলডিংয়ের সরঞ্জাম আনতে চলে গেল দুই ভাই।

ঘড়িতে প্রায় পৌনে তিনটে। তবুও কি দিনটা একটু বদলে যাবার ইঙ্গিত দিল! - বহু দূর ধানক্ষেতের সীমানায় গাঢ় নীল আকাশ মাটি ছুঁয়ে আছে। এত আশর্চ্য অন্য রকম নীল কোথা থেকে নিয়ে আসে শরৎ। পরতে পরতে গাঢ় ছাই আর কাশ ফুলের শাদা নিয়ে গোল গোল মেঘ সূর্যকে পর্যাপ্ত জায়গা ছেড়ে দিয়ে এখানে ওখানে জমাট বাঁধা। হেলানো ঠা-ঠা রোদে ঘাসের ছায়াও ঘাসের ওপর পড়েছে।

একটা গ্যাস-সিলিন্ডারও তো বয়ে আনতে হবে। এত সহজে রাজি হয়ে গেল কী করে। সব মিলিয়ে কতক্ষণের প্রতীক্ষা কে

জানে ক্যারিয়ার খোলাই ছিল, বড় ব্যাগ খুলে সাবধানে রাখা ক্যামেরার ব্যাগটা কাঁধে চাপিয়ে নিলাম। কতক্ষণ আর প্রকৃতির বিচিত্র অবাধ বিন্যাস এত চুপ করে দেখা যায়।

সমর চায়ের প্লাস্টিক কাপ এগিয়ে দিল। রজতের ফ্লাস্কটা জাদুকরের টুপির মতো, উষ্ণ চায়ের উৎস কখনোই ফুরায় না।

চা শেষ করে হাঁটতে শু করলাম। অসংখ্য রঙের আভাস, আরো কত বিচিত্র গঠন-বিন্যাস রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সৌন্দর্যের জন্যেই বাহুল্যের প্রয়োজন। এই বাহুল্য কাজের নয় বলেই বেশি সমৃদ্ধ। বেশ কিছুটা এসে দাঁড়ালাম। পেছনে গাড়িটা খানিকটা ছোট হয়ে গেছে। প্রায় পাশাপাশি দুটো গাছের পাতার ঝিরিঝিরি ফাঁক থেকে বিচিত্র আলোছায়ার নক্সা ঘাসের ঘন বুনুন আর তোবড়ানো পথের ওপর মায়াবী অলস নাড়াচাড়া করছে। সবুজ ক্ষেত্রে টইটম্বুর জল ছুঁয়ে আছে কয়েকটি ফুল ধরা ভালো। তার মাঝ দিয়ে দেখা যায় একটা এদিকে তাকানো ছোট্ট কুঁড়ে। মাত্র একটাই বিস্তৃত জলা ধানক্ষেতের ওপর অজানা কোনো ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো। দূরে নয়, খুব কাছেও নয়। ঠিক যেন ছবির দূরত্ব। এক চিলতে উঠোনের মতো শুকনো জমিতে রোদ আর হাওয়ায় দুলে দুলে শুকুচ্ছে লাল পাড় হলুদ শাড়ি, মেটে সায়া নীল ফ্রক। পেছনে কোন দুর থেকে এসে ধনুকের মতো বাঁক খেয়ে আরো দূরে চলে যাওয়া ঝাউয়ের মতো লম্বা, ঋজু সুবোধ্য গাছের সার। যথেচ্ছ বেগুনী পুল ধরে আছে। ক্যামেরার জন্যে নিখুঁত সাজানো একটা ভূদৃশ্য।

সামনে ঘাসজমির ঢালে ঝোপজঙ্গলের জলে পা ডুবিয়ে একটি মেয়ে ঝুঁকে পড়ে কী তুলছে। ব্যাগ থেকে নিকন, এফ-সেভেন্টি বার করতে করতে ভাবলাম কলমী জাতীয় কিছু হওয়াই সম্ভব। শ্যাওলা-সবুজ ছিটের মলিন কিন্তু অক্ষত। একটি ফ্রক জাতীয় জামা, হাঁটু ছাড়িয়ে নামা অনেকটা মিডি ধরণের। ঐ ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে ভরাট এক কিশোরী । চোখ ফিরিয়ে আবার কুঁড়েতে দৃষ্টি দিলাম। এই স্থির ভূচিত্রে একটু আলগা প্রাণের ছোঁয়া দরকার। ক্লান্ত ডানার এক সারি বক, কিম্বা উঠোনে দাঁড়ানো একটা কুকুর অতবা একটি বৌ জলের ধারে বাসন মাজছে।

হঠাৎ যেন সাড়া পেয়ে চকিত উঠে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে মেয়েটি সাবধানী প্র করল এখানে কী?

বললাম, ঐ সুন্দর বাড়িটার ছবি তুলব ভাবছিলাম। আমাকে জরিপ করার জন্যে সন্দেহ চোখে ঘুরল মেয়েটি।

কিন্তু আমার স্থির খোলা চোখের সামনে অস্বস্তি বোধ করল। এক হাতের মুঠোয় ধরা শাকের আঁটিটা বুকের কাছে তুলে আনল। যেন আড়াল করতে চাইল সতেজ নিটোল বুক দুটো। পনেরো-ষোল-সতেরো যে-কোনোটাই হতে পারে। শাড়ির আঁচলের দরকার ছিল এমন পরিপূর্ণ, নিষ্পাপ, কিশোরী-ঐশ্বর্যময় দুটি স্তনের জন্যে। কিন্তু সম্ভবত শাড়ির বিলাসিতায় যাবার পথ নেই, - সঙ্গে সায়া ব্লাউজও তো লাগে চকিতে বুদ্ধদেব বসু মনে পড়ল,

এমনকি পথে-পথে বেড়ায় যে ভিখারিনী মেয়ে
আঁস্তাকুড়ে খাদ্যকণা খেয়ে, অতি জীর্ণ জঘন্য মলিন যার বাস,
তাকেও ছাড়ে না
যৌবনের ক্ষমাহীন সেনা।
তাকেও সুন্দর করে, তাকেও সাজায়,
লজ্জা দেয়, ভঙ্গি দেয়, দেহ ভ'রে তোলে
লাবণ্য হিল্লোলে।

খানিকটা অবিশ্বাসে মেয়েটি বলল, এখানে কেন, কাছে চলে যাও না।

দূরের ছবির জন্যে যে এখন আর কাছের দরকার হয় না ওকে হয়তো বোঝানো যাবে না। ক্যামেরায় টুয়েন্টি এইট-টু হ
ান্ড্রেড এম-এম জুম্ লাগানো আছে। বললাম কাছে যাব কী করে সব তো জল। এখান থেকেই আমার খুব সুন্দর লাগছে,
তাই তুলব ভাবছিলাম-তোমার লাগছে না?

মেয়েটি গলায় মৃদু ধার রেখে বলল, আমি তো আর ছবি তুলছি না।
তারপর যেন আমার কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে ঘাড় ঘুড়িয়ে কুঁড়েটা একটু দেখল। তারপর বলল, কোথা থেকে অ
াসছ?
বললাম, কলকাতা, তুমি কলকাতা যাও?
এবার স্বাভাবিক উদাস ভঙ্গিতে বলল, না যাইনি কখনো।
অবাক হয়ে বললাম, সেকি, কলকাতা দেখইনি কোনোদিন। যেতে ইচ্ছে করে না?
বলল নাঃ, জানিই না কী করে যায়। অনেক দূর তো । কে নিয়ে যাবে।
বললাম, তুমি কোথায় থাকো?
মেয়েটি এবার নিঃসঙ্কোচে বুকের আড়াল সরিয়ে নিয়ে হাত তুলে রাস্তার ওপারে খানিকটা দূরে কয়েকটি দূঁড়ের জটলার
দিকে দেখিয়ে বলল, ওখানে।
বললাম, বাড়িতে কে আছে?
বলল, বাবা মা আর দাদা
বললাম, বাঃ এক ভাই এক বোন! খুব ভালো তো। এক ভাই-বোন, হওয়াই সবচেয়ে ভালো।
মেয়েটি প্রথম নিঃশব্দ সুন্দর হাসল। বললাম, তুমি ইস্কুলে পড়?
একুট হতাশ গলায় মেয়েটি বলল, এখন আর পড়ি না, ছেড়ে দিয়েছি।
- ছেড়ে দিলে কেন ?
- অনেক খরচা
- ক্লাস সেভেন
উৎসাহে বললাম, ক্লাস সেভেন। অনেক পড়েছ তো। তার মানে তুমি বাংলা, ইংরিজি, অঙ্ক সব জানো।
মেয়েটি আরো সুন্দর সাবলীল সলজ্জ হাসল, অল্প অল্প
- আর তোমার দাদা ?
- মাধ্যমিক দেবে।
প্রকৃত ভালোলাগায় বললাম, খুব ভালো তো ! - স্কুলে কি অনেক মাইনে ?
বলল, মাইনে লাগে না।
- তাহলে বলল যে অনেক খরচ?
- বাঃ বই, খাতা কলম এসব লাগে না! ভালো জামা পরতে হয়। জুতো লাগে।
- এসব নিয়মও আছে?
- থাকবে না। বড় ইস্কুল তো।
- কিন্তু তোমার দাদা পড়ে তো
- ঐ তো একজনই যথেষ্ট। দুজন পড়া যাবে না।
- তাহলে তুমি এখন কী কর?
- কাজ করি।
- কাজ মানে, চাকরি?
- না, বাড়ির কাজ করি।

- তোমার মা করেন না ?
- মাও করে, তবে মাকে বিড়ি বাঁধতে হয়।
- বাঃ তাই ? বিড়ি বাঁধলে কত পয়সা পাওয়া যায় ?
- এক হাজার করলে তিরিশ টাকা
- দিনে এক হাজার বিড়ি বাঁধতে পারেন ?
- আরো অনেক বেশি
- কত ?
- দু হাজার, আড়াই হাজার।
- তাহলে, আড়াই হাজার করে বাঁধতে পারলে তো দিনে পঁচাত্তর টাকা করে হয়।
- রোজ তো অত পারে না, কোনো দিন একেবারেই বাঁধতে পারে না।
- কেন ?
- অন্য কাজ থাকে। শরীরও খারাপ হয়।
- তোমার বাবা কী করেন?
- চাষ করে।
- তোমাদের কত জমি অছে ?
- আমাদের কোনো জমি নেই ?
- ঐ বাড়ির সঙ্গে একটুখানি।
- তাহলে কীভাবে কোথায় চাষ করেন?
- টাকা দিয়ে অন্যের কাছ থেকে জমি নিয়ে।
- তবে তুমি যে বলছিলে খরচের জন্যে তোমার পড়া হলো না।
- জমির জন্যে ঋণ-করতে হয়।
- তারপর শোধ হয় কেমন করে ? সেই ধান বিক্রী করে ?
- সবটা শোধ হয় না। কিছুটা বিক্রী হয়, কিছুটা আমাদের বাড়িতে লাগে। জমির মালিকও খানিকটা নেয়।
- তাহলে ?
- আবার ঋণ করতে হয়। এরকম অসুবিধে করেই চলে আর কি।

মনে হলো ক্লান্ত করছি ওকে। অন্য প্রসঙ্গের জন্যে অন্তরঙ্গ হাসলাম, এতক্ষণ তোমার নামটাই জানা হয়নি। মেয়েটি সহজ সলজ্জ হাসল, ভগবতী।

বললাম, সুন্দর নাম তো। জানো তো আমাদের দেশে ঠাকুরের নামই সবচেয়ে বেশি।

একটু আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে মেয়েটি বলল, কোন ঠাকুরের?

বললাম, এই যেমন, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মহাদেব, কার্তিক, গণেশ, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী। তোমার পদবী কী?

- ভারতী।
- ভগবতী ভারতী! চমৎকার তো। ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে- ভগবতী মানে জানো ?
- সরস্বতী।
- তাহলে ভারতী?
- ভারতীও সরস্বতী।
- বাঃ তুমি তো অনেক জানো। যা বলেছ ঠিকই, তবে একদম ঠিক নয়। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরম পূজনীয় ভগবান, তেমনি স্ত্রীলিঙ্গে ভগবতী, দুর্গা ও সরস্বতী, দুজনেই। এঁরা পরম পূজনীয় ও মান্য ।
- অত জানি না।
- অত না জানলেও চলবে, যতটুকু বলেছ তা-ই তো যথেষ্ট-তোমার বাবার নাম?

- অরবিন্দ ভারতী।
তোমাদের এত সুন্দর সব নাম কে দিল!
- জানি না।
তারপর কয়েক মুহূর্ত চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থেকে বলল, ঐ ঘরের ছবি তুললে না?
বললাম, না, ইচ্ছে করছে না। তারচেয়ে তোমার ছবি তুলি।
অপ্রত্যাশার লজ্জায় আড়ষ্ট হলো। শুধু আমার চোখে পড়ার মতো চোখে খুশির আবছা রেশ টেনে বলল, আমার! এভাবে?
বললাম, এভাবেই তো ভালো। এভাবেই তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।
শাকের আঁটিটা ঘাসের ওপর নামিয়ে রেখে দু'আঙুলে কপালে ঝুলে আসা চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে উজ্জ্বল মৃদু হাসল, তোলো।

হাতে ধরা এফ-সেভেন্টি উইথ টুয়েন্টি এইট-টু হান্ড্রেড জুম ব্যাগে ভরে রেখে ম্যানুয়াল অপারেশন মিনোল্টা, বের করলাম। ওয়ান পয়েন্ট ফোর। পৃথিবীর সবচেয়ে উচচগুণের শক্তিশালী সিঙ্গল ফোকাল লেংথ লেন্স। এই মুহূর্তে মনটা পুরোপুরি জমাট বেঁধেছে ওর একটাতীক্ষ্ণ উজ্জ্বল মস্ত মুখ ধরে রাখার জন্যে।
কয়েকটা তোলার পর অনেকটা তালগাছের মতো বাহার কচি সবুজ জংলা পাতার একটা ছোট গাছের পাশে নিজেই গিয়ে দাঁড়াল। বলল, এখানে দাঁড়াব?
বললাম, তোমার যেখানে ইচ্ছে দাঁড়াও।
তারপর আরো দুটো ছবি তুলে বললাম, তোমার ছবি তো তোমাকে দেবার উপায় নেই মনে হলো কথাটা শুনতেই পায়নি। একটু সরে গিয়ে দূরে আমাদের গাড়িটা দেখতে দেখতে বলল, ঐ গাড়িটা তোমাদের ?
বললাম হ্যাঁ।
- এখানে থামলে কেন ?
- খারাপ হয়ে গেছে, সারানো হচ্ছে।
- কখন সারানো হবে?
- এক্ষুণি চলে যাবে।
বললাম, হ্যাঁ।
মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল, যাই কাজ আছে, মা খোঁজ করবে। বললাম, কিন্তু ছবির কথা তো কিছু বললে না?
ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটি বলল, কী বলব?
বললাম, বাড়ির কোনো ঠিকানা, সেখানে ছবিগুলো পাঠানো যায় কিনা।
মেয়েটি মুখ ফেরাল, তুমিই রেখে দিও।
বললাম, আমি রেখে দিলে তোমার ভালো লাগবে?
গাড়ি সারানো হয়ে গেছে। ইঞ্জিন চালু ও দরজা বন্ধ হওয়ার ঝাপসা আওয়াজ পেলাম। ক্রমশ গাড়িটা আমার কাছে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে নিজের পাশে আসনটা দেখিয়ে রজত বলল, দত্তদা উঠে পড়ুন।
মেয়েটি পায়ে পায়ে খানিকটা সরে গেল। উঠে বসে আমি হাত নাড়লাম। মেয়েটি কোনো সাড়া দিল না। অন্যমনস্কের মতো একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। গাড়িটা চলতে শু করেছে। আমি দাঁড় করাতে বলে নেমে এলাম। দ্রুত পায়ে কাছাকাছি এসে ডাকলাম, ভগবতী।
মেয়েটি চমকে ঘুরে আশ্চর্য অপলক তাকিয়ে রইল। ইচ্ছে হোল বলি যাবে আমার সঙ্গে কলকাতায়? বাঁ-হাত বাড়িয়ে ওর ডান হাতটা টেনে নিয়ে পকেট থেকে দামি বিদেশী জটার বল-পেনটা ওর হাতের পাতায় দিয়ে বললাম, তুমি তো লিখতে জানো, এটা দিয়ে লিখ।
তেমনি তাকিয়ে থেকে বলল, কী লিখব?

এক মুহূর্ত ভেবে বললাম, চিঠি। তোমার যাকে ভালো লাগবে, ইচ্ছে করবে তাকেই লিখ। শুধু আজ নয়, আরো পরে যখন আরো বড় হবে, বিয়ে হবে তখন লেখার জন্যে অনেককে পেয়ে যাবে।
মেয়েটি চোখ নামিয়ে হাতে ধরা পেনটা দেখল। বলল, তোমাকে?
বললাম, আমাকে তোমার মনে থাকবে?
চোখ তুলে বলল, হ্যাঁ থাকবে।
বললাম, তাহ'লে আমাকে বরং মনে মনেই লিখ। - এবার তাহলে যাই?
গাড়িতে ফিরতে ফিরতে মনে হ'লো এখান থেকে ফিরে গেলেই বা ক্ষতি কী। সমুদ্র তো অনেকবারই দেখা হয়েছে, আরো অনেকবার হবে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com